বাংলাদেশে নির্যাতনের জন্য জবাবদিহি ও ক্ষতিপূরণ: ভুক্তভোগীদের অভিজ্ঞতা

ব্রিফিং পেপার

এপ্রিল ২০২৬

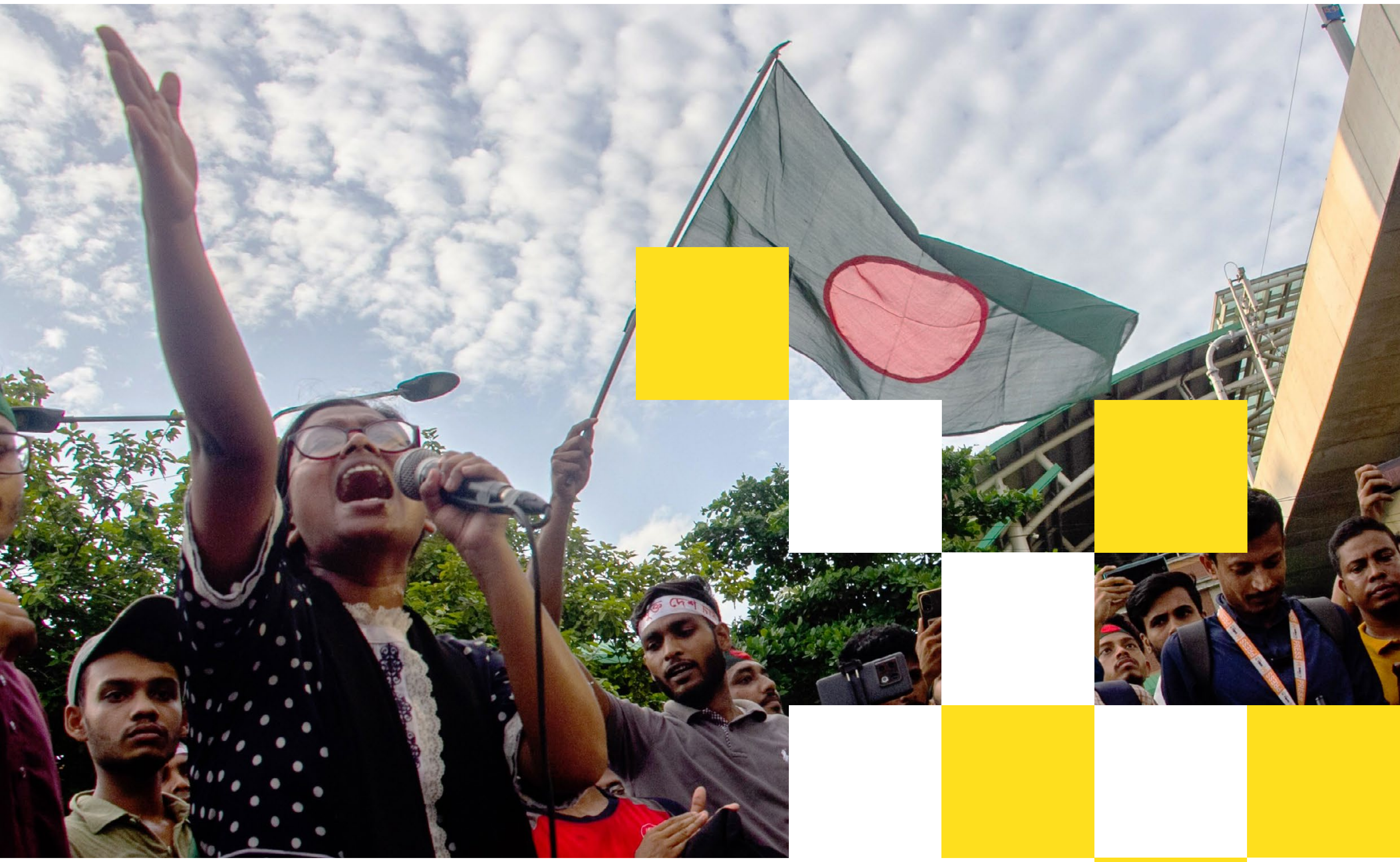

REDRESS
Ending torture, seeking justice for survivors

blast
ব্লাস্ট

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এবং রিড্রেস REDRESS জুলাই ২০২৪ থেকে শুরু হওয়া বাংলাদেশের সংকট মোকাবিলায় নির্যাতনের জন্য জবাবদিহিতা ও ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে আইন ও নীতিগত সংস্কারের উদ্যোগ নিচ্ছে এবং ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার ও ক্ষতিপূরণে প্রবেশাধিকার জোরদার করতে কাজ করছে।

এই প্রকাশনাটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে এবং United Against Torture Consortium (UATC) উদ্যোগের আওতায় প্রস্তুত করা হয়েছে। এর বিষয়বস্তুর পূর্ণ দায়ভার রিড্রেস ও ব্লাস্টের; এটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতামত প্রতিফলিত করে না।

UNITED AGAINST TORTURE

Funded by the European Union

ভূমিকা

এই ব্রিফিং পেপারটির লক্ষ্য হলো ২০২৪ সালের জুলাই/আগস্টের আন্দোলনের সময় বাংলাদেশে সংঘটিত সহিংসতা (নির্যাতন এবং অন্যান্য গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন) থেকে ভুক্তভোগী ব্যাক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা। এটি বিশেষভাবে সহিংসতার পর বিচার ও জবাবদিহিতা সম্পর্কিত ভুক্তভোগীদের অভিজ্ঞতা, তাদের অগ্রাধিকার, উদ্দেশ্য, এবং বিচারপ্রাপ্তিতে তারা যে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন, সেইসঙ্গে ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত তাদের প্রত্যাশার ওপর গুরুত্ব দেয়।

এই নথিটির প্রধান উদ্দেশ্য হলো ২০২৪ সালের জুলাই/আগস্ট আন্দোলনের ভুক্তভোগী ব্যক্তিদের জন্য বাংলাদেশে ক্ষতিপূরণমূলক উদ্যোগগুলোকে অবহিত করা এবং এগুলোকে উৎসাহিত করা, যাতে এই উদ্যোগগুলো বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের মতামতের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, তারা বর্তমানে বিচার ও ক্ষতিপূরণ পেতে যে বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন তার প্রতি সাড়া দেয়, এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

এই নথিতে উপস্থাপিত তথ্য প্রধানত ২০২৫ সালে পরিচালিত নথিভুক্তকরণ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) একটি কাঠামোবদ্ধ ও উদ্দেশ্যনির্ভর শনাক্তকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গণঅভ্যুত্থানে ক্ষতিগ্রস্ত ৮০ জন ভুক্তভোগীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। প্রশ্নাবলিটি জাতিসংঘের ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশন কর্তৃক উন্নত সরঞ্জামের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়, যা বাংলাদেশের আইনগত প্রেক্ষাপটে খাপ খাইয়ে নেওয়া হয় এবং ব্লাস্টের আইনগত দলের দ্বারা পর্যালোচিত হয়। সাক্ষাৎকারগুলো ভুক্তভোগীদের নির্বাচিত স্থানে পরিচালিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় ভুক্তভোগীরা যেসব লঙ্ঘনের শিকার হয়েছেন তা ছাড়াও তাদের বয়স ও লিঙ্গ, প্রাপ্ত কোনো সহায়তা, ন্যায়বিচারের প্রতি তাদের আগ্রহ, অগ্রাধিকার, ব্যক্তিগত আইনগত দাবি অনুসরণ করার অভিপ্রায়, এবং সরকারের কাছ থেকে তারা যে ধরনের প্রতিকার প্রত্যাশা করেন—এসব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

যদিও এই নথিতে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা ৮০ জন ভুক্তভোগীর অভিজ্ঞতার মধ্যে কিছু স্পষ্ট প্রবণতা চিহ্নিত করা হয়েছে, তথাপি এই তথ্যসমূহ দেশের সকল ভুক্তভোগীর পরিস্থিতিকে অবশ্যই প্রতিফলিত করে না। বরং এটি এই ৮০ জন ভুক্তভোগীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তুলে ধরে এবং প্রতিকারে প্রবেশের ক্ষেত্রে বিদ্যমান কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতাগুলোকে আলোকপাত করে—যার মধ্যে আমাদের পূর্ববর্তী ব্রিফিং পেপারে চিহ্নিত কয়েকটি বাধাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উক্ত ব্রিফিং পেপারটি হলো **"বাংলাদেশে নির্যাতনের শিকারদের জন্য প্রতিকারের পথসমূহ অনুসন্ধান"**, যা ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সালে রিড্রেস (REDRESS) ও ব্লাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে জুলাই/আগস্ট ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানটি মূলত বেসামরিক জনগণের বিরুদ্ধে সংঘটিত পদ্ধতিগত ও ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের মাধ্যমে চিহ্নিত ছিল। বিক্ষোভকারী ও অন্যান্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে সহিংসতার ফলে হত্যাকাণ্ড, স্বেচ্ছাচারী আটক এবং নির্যাতনসহ গুরুতর অপরাধের শিকার হয়ে হাজার হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হন। জাতিসংঘের ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশনের প্রতিবেদনের মতে, বিক্ষোভ–সম্পর্কিত অন্তত ১,৪০০টি মৃত্যুর ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে, যার অধিকাংশই আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারজনিত—এর মধ্যে সামরিক মানের অস্ত্র ও নিরাপত্তা বাহিনী এবং তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আধাসামরিক গোষ্ঠীর ব্যবহৃত সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া, প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে ১১,৭০২ জনেরও বেশি ব্যক্তিকে স্বেচ্ছাচারীভাবে গ্রেপ্তার করা হয়, যাদের অনেকেই নির্যাতন ও অমানবিক আটক পরিস্থিতির শিকার হন; পাশাপাশি কেউ কেউ লিঙ্গভিত্তিক ও যৌন সহিংসতার—যার মধ্যে ধর্ষণও অন্তর্ভুক্ত—শিকার হন। হাজার হাজার ব্যক্তি গুরুতর ও জীবন পরিবর্তনকারী আঘাত প্রাপ্ত হন।

বাংলাদেশ নির্যাতনসহ গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকারদের জন্য পূর্ণাঙ্গ প্রতিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে একাধিক আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেছে। এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি (আইসিসিপিআর), নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) এবং নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক বা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে কনভেনশন (ইউএনক্যাট)–সহ বেশ কয়েকটি মূল মানবাধিকার চুক্তি অনুসমর্থন করেছে। ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সালে বাংলাদেশ ইউএনক্যাট-এর ১৪ অনুচ্ছেদের ওপর আরোপিত সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে এসব অঙ্গীকার আরও সুদৃঢ় করে, যার ফলে নির্যাতনের শিকারদের জন্য কার্যকর প্রতিকার ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতা আরও জোরদার হয়।

এই চুক্তিসমূহ অনুসমর্থনের ফলস্বরূপ, মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায় রাষ্ট্রের ওপর বর্তালে বাংলাদেশ প্রতিকার প্রদানের বাধ্যবাধকতার অধীন—বিশেষত যখন এসব লঙ্ঘন রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা সংঘটিত হয় অথবা তাদের সহনশীলতা বা সম্মতির মাধ্যমে ঘটে। যেখানে লঙ্ঘনগুলো বেসরকারি পক্ষের মাধ্যমে সংঘটিত হয়, সেখানেও রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা বজায় থাকে—অর্থাৎ এমন কার্যকর অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা, যার মাধ্যমে ভুক্তভোগীরা প্রতিকার লাভ করতে পারেন, অপরাধীর প্রতিকার প্রদানে সক্ষমতা বা সদিচ্ছা থাকুক বা না থাকুক।

ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সালে রিড্রেস ও ব্লাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত ব্রিফিং পেপারটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও বাংলাদেশের গৃহীত বাধ্যবাধকতার আলোকে গণঅভ্যুত্থানের ভুক্তভোগীদের জন্য ন্যায়বিচার ও প্রতিকারে প্রবেশের প্রধান পথসমূহ বিশ্লেষণ করে। এতে ভুক্তভোগীদের প্রতিকারে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা এবং বিদ্যমান পথগুলোর সীমাবদ্ধতাও পর্যালোচনা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, এতে উপসংহারে বলা হয়েছে যে জুলাই/আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের সময় নির্যাতন ও অন্যান্য গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকারদের জন্য বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনগত পথসমূহ—যার মধ্যে নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু আইন অনুযায়ী বিচারিক কার্যক্রম, সাধারণ ফৌজদারি প্রক্রিয়া এবং সাংবিধানিক রিট আবেদন প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত—জটিল, দীর্ঘসূত্রতার শিকার এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও পূর্ণাঙ্গ প্রতিকার প্রদানে সীমিত সক্ষমতাসম্পন্ন।

অন্তর্বর্তী সরকার ভুক্তভোগীদের জরুরি প্রয়োজনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে যে প্রশাসনিক প্রতিকার ব্যবস্থাসমূহ প্রণয়ন করে—যার মধ্যে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন ও ত্রাণ তহবিল প্রতিষ্ঠা অন্তর্ভুক্ত—সেগুলোকে পূর্ণাঙ্গ প্রতিকার প্রকল্প নয়, বরং জরুরি সহায়তামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কল্পনা করা হয়েছিল। তদুপরি, এসব প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ, অর্থ বিতরণে বিলম্ব, ভুক্তভোগীদের জন্য অপর্যাপ্ত সুরক্ষা এবং সীমিত পরিমাণ ক্ষতিপূরণের মতো সমস্যাও উঠে এসেছে।

ভুক্তভোগীদের সঙ্গে সম্পৃক্ততা

ব্লাস্ট ৮০ জন ভুক্তভোগীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে, যার মাধ্যমে স্বেচ্ছাচারী আটক, নির্যাতন, গুরুতর আঘাত এবং অন্যান্য ধরনের নিপীড়নের ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে। এই তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য ছিল ঘটনাসমূহের বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহের পাশাপাশি ভুক্তভোগীদের প্রধান অগ্রাধিকার ও চাহিদাসমূহ চিহ্নিত করা। সকল ভুক্তভোগীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় ব্লাস্ট কর্তৃক প্রণীত একটি যাচাই ও বাছাই (স্ক্রিনিং) প্রক্রিয়া এবং তথ্য যাচাই পদ্ধতি অনুসরণ করে, যার মধ্যে ভুক্তভোগীদের সম্মতিক্রমে চিকিৎসা নথি পর্যালোচনা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অতিরিক্ত মন্তব্য ও প্রতিফলন সংগ্রহ করা হয় ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্লাস্টের উদ্যোগে আয়োজিত **"জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ভুক্তভোগীদের জন্য ন্যায়বিচার ও প্রতিকার সম্পর্কে প্রতিফলন"** শীর্ষক কর্মশালার মাধ্যমে। এই কর্মশালায় ভুক্তভোগী ও তাদের স্বজনরা, সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী ব্যক্তিবর্গ এবং নাগরিক সমাজ সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন, যেখানে ভুক্তভোগীদের জন্য জবাবদিহি ও প্রতিকারের সম্ভাব্য পথসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য

৮০ জন ভুক্তভোগীর মধ্যে অন্তত ৬৮ জন গুরুতর চোখের আঘাতের শিকার হন, যার ফলে তারা দৃষ্টিশক্তি হারান। তাদের চোখে ছররা গুলি (পেলেট) বিদ্ধ হয়ে কর্নিয়া ও রেটিনায় অপরিবর্তনীয় ক্ষতি সৃষ্টি করে। অন্যরা গুলিবিদ্ধ এবং মেরুদণ্ডে আঘাতজনিত কারণে স্থায়ী চলাচল–সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতার শিকার হন, যার ফলে তারা আগের মতো দাঁড়াতে বা হাঁটতে সক্ষম নন। একাধিক ব্যক্তি কাছ থেকে নিক্ষিপ্ত শব্দ–গ্রেনেডের বিস্ফোরণে শ্রবণশক্তি হারান; এতে তাদের কানের পর্দা ফেটে যায় এবং দীর্ঘমেয়াদি অসংলগ্নতা ও বিভ্রান্তি তৈরি হয়। অনেক ভুক্তভোগী এখনও গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী মানসিক আঘাতে ভুগছেন।

সাক্ষাৎকার দেওয়া ভুক্তভোগীদের ৯১% গুলিবিদ্ধ হয়েছেন

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা ৮০ জনের মধ্যে ৭৩ জন নিরাপত্তা বাহিনী বা তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আধাসামরিক গোষ্ঠীর ছোড়া গুলিতে আহত হন। অবশিষ্টরা জানান যে তারা ভোঁতা অস্ত্রের আঘাতে আহত হয়েছেন এবং কিছু ক্ষেত্রে ধারালো অস্ত্রের আঘাতও পেয়েছেন।

সাক্ষাৎকার দেওয়া ভুক্তভোগীদের ৬% স্বেচ্ছাচারীভাবে আটক হয়েছিলেন

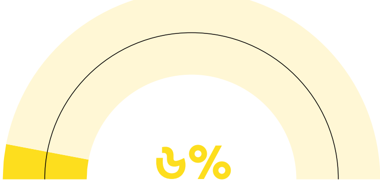

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা ৮০ জনের মধ্যে পাঁচজন জানান যে তারা স্বেচ্ছাচারীভাবে আটক হয়েছিলেন। তাদের সকলেই আটক অবস্থায় নির্যাতন ও অন্য এমন আচরণের শিকার হওয়ার কথা বর্ণনা করেন, যা নির্যাতনের শামিল হতে পারে—এর মধ্যে হেফাজতে শারীরিক প্রহার এবং অমানবিক আটক পরিস্থিতি অন্তর্ভুক্ত।

সাক্ষাৎকার দেওয়া ভুক্তভোগীদের ৭৯% ইতোমধ্যে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন থেকে কোনো না কোনো সহায়তা পেয়েছেন

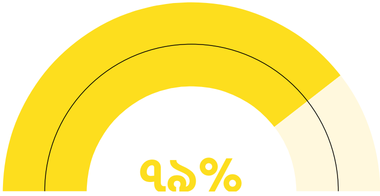

৮০ জন ভুক্তভোগীর মধ্যে মাত্র ১৭ জন কোনো ধরনের ত্রাণ পাননি অথবা প্রাপ্ত সহায়তা সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব ছিল। এদের মধ্যে ১৬ জন ইতোমধ্যে আবেদন করেছেন এবং জবাবের অপেক্ষায় ছিলেন, আর বাকি ব্যক্তিরা অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণের জন্য আবেদন না করার সিদ্ধান্ত নেন।

পারভিনের গল্প

পারভিন ঢাকার বাসিন্দা ২৭ বছর বয়সী একজন নারী। তিনি একজন পোশাকশ্রমিক। জুলাই ২০২৪ সালে কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে সহিংসতার সময় পুলিশের অভিযানের মধ্যে তিনি আটকা পড়েন। ছররা বন্দুকের ছয়টি গুলি তার চোখের কর্নিয়া সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয়। তিনি বিক্ষোভে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছিলেন না।

তার জরুরি অবস্থা ব্লাস্ট কর্তৃক নথিভুক্ত হওয়ার পর, তারা দ্রুত চিকিৎসা সহায়তার জন্য রেফারালের উদ্যোগ নেয়। বাংলাদেশের ভেতরে এবং প্রবাসে থাকা বাংলাদেশিরা এগিয়ে এসে পারভিনের মতো পৃথক ভুক্তভোগীদের সহায়তার দায়িত্ব অনানুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেন। তারা হাসপাতালের বিল, বাড়িভাড়া এবং দৈনন্দিন খরচ বহন করেন।

© BLAST

শ্রীলঙ্কা থেকে একটি দাতা কর্নিয়া উড়িয়ে আনা হয়। অস্ত্রোপচার করা হয়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ক্ষতিটি ছিল অপরিবর্তনীয়। পারভিন দুই চোখেই সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিশক্তি হারান।

পারভিনের গল্পে প্রথম ব্যর্থতাটি ছিল কাঠামোগত। ব্যাপক মাত্রায় চোখের আঘাতের মতো জরুরি পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক সাড়া দেওয়ার জন্য উপযুক্ত ও বিকেন্দ্রীভূত কোনো জরুরি চিকিৎসা কেন্দ্র ছিল না। এ ধরনের ক্ষেত্রে ঘণ্টাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ব্যবস্থাটি তাকে ব্যর্থ করেছে।

অস্ত্রোপচারের পর পারভিন ব্লাস্টকে ঘটনার আগের নিজের কিছু ছবি দেখান। তিনি বলেন, "দেখুন, আগে আমি কত সুন্দর ছিলাম। আগে আমার স্বামী আমাকে মারধর করত। এখন আহত হওয়ার পর সে আর মারধর করে না। কিন্তু আমি ভয় পাই—সে হয়তো অন্য নারীদের দিকে ঝুঁকছে। আমি আর সুন্দর নই। জানি না, সে আমাকে আর কতদিন রাখবে।"

পারভিনের জন্য কার্যকর প্রতিকার কেবল চিকিৎসা ব্যয়ের ক্ষতিপূরণে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। তার প্রয়োজন রূপান্তরমূলক প্রতিকার—যার মধ্যে প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা, পুনর্বাসন ও মানসিক-সামাজিক সহায়তা, নিরাপদ বাসস্থান, গৃহস্থালি ও অন্যান্য লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা থেকে সুরক্ষা, এবং অর্থনৈতিক পুনঃএকীভূতকরণ অন্তর্ভুক্ত।

জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন থেকে সহায়তা পাওয়া সকল সফল আবেদনকারী প্রায় ৮০০ মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ একটি নির্ধারিত অর্থ পেয়েছেন। ভুক্তভোগীরা যে ধরনের এবং কতটুকু ক্ষতির শিকার হয়েছেন তার ওপর ভিত্তি করে ফাউন্ডেশন তাদের আঘাতকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে। তবে বহু ভুক্তভোগীর পক্ষ থেকে একটি প্রধান উদ্বেগ হিসেবে উঠে এসেছে যে অপর্যাপ্ত চিকিৎসা মূল্যায়নের কারণে তাদের প্রায়ই নিম্নতর শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা তাদের ভোগ করা ক্ষতির প্রকৃত গুরুতরতাকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে না। এর ফলে তারা অতিরিক্ত সহায়তা—যেমন চিকিৎসা সেবা—পাননি, যা কেবল উচ্চতর শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্যই উপলব্ধ ছিল।

উদাহরণস্বরূপ, চোখের গুরুতর আঘাত বা শরীরের বিভিন্ন অংশে, এমনকি মাথার খুলির ভেতরে, ছররা গুলি বিদ্ধ থাকার মতো গুরুতর ঘটনাগুলোকেও প্রায়শই অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ভুল শ্রেণিবিন্যাস শুধু তাদের আঘাতের গুরুতরতাকেই খাটো করে দেখায়নি, বরং এর ফলে তাদের জন্য পর্যাপ্ত সহায়তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

সাক্ষাৎকার দেওয়া ভুক্তভোগীদের ৫৮% বলেছেন যে তাদের চিকিৎসা প্রয়োজন ছিল বা আরও চিকিৎসার দরকার রয়েছে

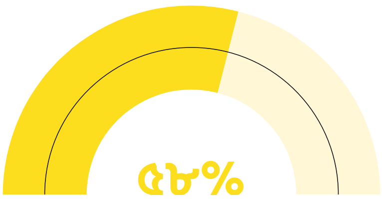

সাক্ষাৎকার দেওয়া ভুক্তভোগীদের মধ্যে ৪৬ জন জানান যে তাদের চিকিৎসা প্রয়োজন ছিল অথবা অতিরিক্ত চিকিৎসার দরকার রয়েছে। তিনজন জানান যে চিকিৎসকরা তাদের বলেছেন—আর কোনো চিকিৎসার বিকল্প বর্তমানে উপলব্ধ নেই। ২৭ জন মনে করেছেন যে তাদের চিকিৎসার প্রয়োজন নেই, আর পাঁচজন জানান যে সাক্ষাৎকারের সময় তারা ইতোমধ্যে চিকিৎসা গ্রহণ করছিলেন।

সাক্ষাৎকার দেওয়া ভুক্তভোগীদের ৭৮% ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করেছেন

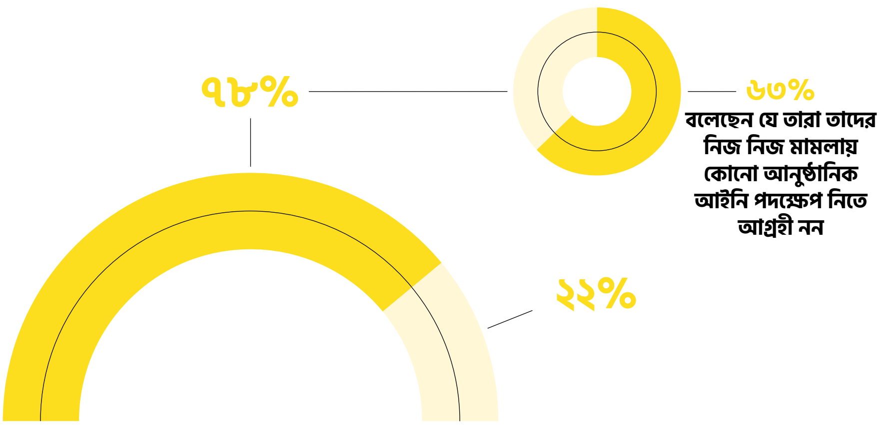

সাক্ষাৎকার নেওয়া জীবিতদের মধ্যে ৭৮ শতাংশ ন্যায়বিচার পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, আর ২২ শতাংশ বলেছেন যে তাদের সঙ্গে যা ঘটেছে তার ক্ষেত্রে তারা ন্যায়বিচারে আগ্রহী নন।

তবে যেসব ৭৮ শতাংশ ন্যায়বিচার চাইছেন, তাদের মধ্যেও ৬৩ শতাংশ বলেছেন যে তারা তাদের নিজ নিজ মামলায় কোনো আনুষ্ঠানিক আইনি পদক্ষেপ নিতে আগ্রহী নন।

আরমান ও তার মায়ের গল্প

চট্টগ্রামে ব্লাস্ট (BLAST) এক মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, যিনি তার কিশোর ছেলে আরমানের দেখভাল করছেন। ১৮ জুলাই ২০২৪ সালে গুলিবিদ্ধ হয়ে আরমান তার শরীরের নিচের অংশে গুরুতর আঘাত পান, যার ফলে তিনি স্থায়ীভাবে চলাচলে অক্ষম হয়ে পড়েন এবং চলাফেরার জন্য সম্পূর্ণভাবে অন্যের সহায়তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে যান। একই সঙ্গে ওই মা আরেক সন্তানেরও যত্ন নিচ্ছিলেন, যে গুরুতর শেখার প্রতিবন্ধকতায় ভুগছে।

ব্লাস্ট দলের কাছে তিনি যখন সহায়তার জন্য আসেন, তখন দায়ীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করার দাবি দিয়ে তিনি কথা শুরু করেননি। বরং তিনি আরমানের জন্মসনদ সংগ্রহে সহায়তা চান, যাতে তিনি রাষ্ট্রের আর্থিক সহায়তা নিতে পারেন। কিন্তু তার স্বামী ইচ্ছাকৃতভাবে বিদ্বেষবশত সেখানে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছিলেন।

তিনি যে সহিংসতার মুখোমুখি হচ্ছিলেন, তা শারীরিক সহিংসতার পাশাপাশি প্রশাসনিক সহিংসতাও ছিল।

অতএব, প্রতিকার ব্যবস্থাকে অবশ্যই পরিচর্যাকারীদের অধিকার, পরিচর্যার ভার, এবং নির্ভরশীলতার কাঠামোকে বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

© আরমান এবং BLAST, নির্যাতনের শিকারদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ — জুলাই প্রকল্প কর্মশালা

ব্লাস্ট (BLAST) কর্তৃক পরিচালিত সাক্ষাৎকারগুলোর সময় ভুক্তভোগীদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল—তারা জবাবদিহি প্রক্রিয়া বা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে ন্যায়বিচার অনুসরণ করতে কতটা আগ্রহী ও প্রস্তুত। প্রশ্নাবলিতে বিভিন্ন ধরনের প্রতিকার সম্পর্কে তাদের অগ্রাধিকার ও প্রত্যাশাও বোঝার চেষ্টা করা হয়। সাক্ষাৎকার দেওয়া ব্যক্তিদের একটি সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ খোলাখুলিভাবে ন্যায়বিচারের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন—যার মধ্যে অপরাধীদের জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং প্রতিকারে প্রবেশাধিকার দুটোই অন্তর্ভুক্ত।

ন্যায়বিচার চান বলে জানান এমন ৬৪ জনের মধ্যে ৪০ জন বলেন যে তারা নিজেদের মামলায় কোনো আইনগত পদক্ষেপ নিতে আগ্রহী নন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এই অনীহার নির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করেননি; তবে যারা ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখিত কারণগুলো ছিল নিম্নরূপ (এবং কেউ কেউ একাধিক কারণ উল্লেখ করেছেন):

- "ঝামেলা এড়ানোর" ইচ্ছা (যার মধ্যে আইনগত জটিলতা ও ব্যয় অন্তর্ভুক্ত)
- রাজনৈতিক ঝুঁকি এবং প্রতিশোধের আশঙ্কা
- শারীরিক অসুস্থতা এবং চিকিৎসাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রয়োজন
- জ্ঞানের অভাব এবং দিকনির্দেশনার প্রয়োজন
- পারিবারিক সিদ্ধান্ত বা পারিবারিক চাপ

মামলা না করার কারণসমূহ

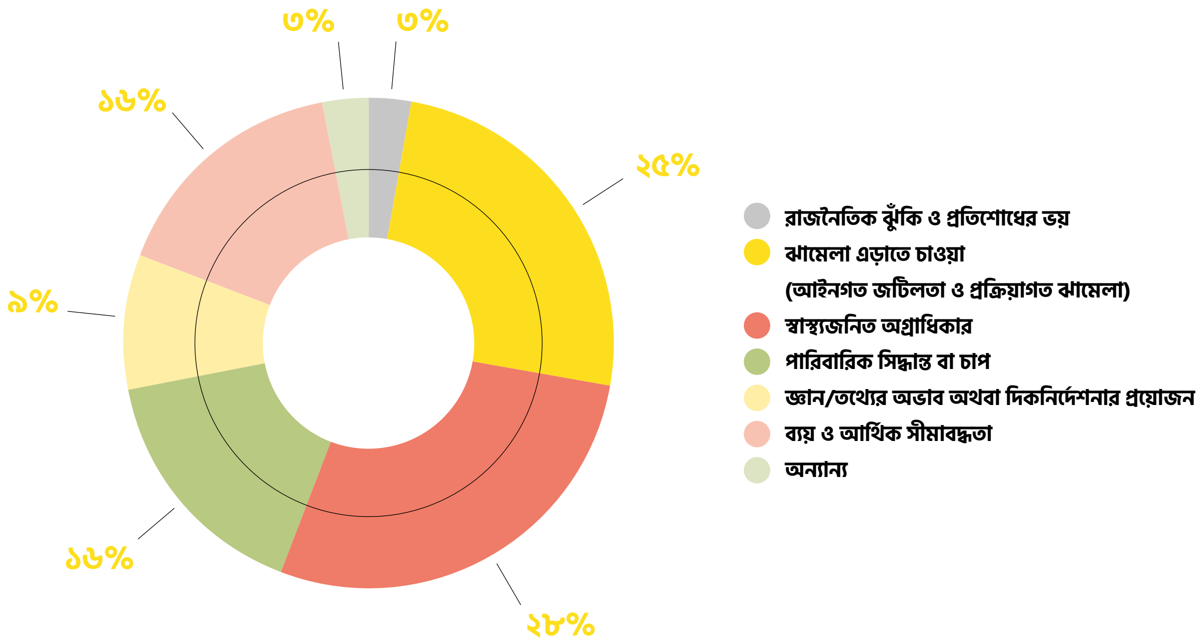

সাক্ষাৎকার নেওয়া ৮০ জন ভুক্তভোগীর মধ্যে ৬৬ জন জানান যে তারা নিজেদের মামলার ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার–সংক্রান্ত কোনো প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে আগ্রহী নন—হোক তা আগ্রহের অভাবের কারণে, অথবা আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া এড়িয়ে চলার পছন্দ থেকে।

ভুক্তভোগীদের বিচার বিভাগ বা আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার কাছে তাদের মামলা জানানোর ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হিসেবে উঠে এসেছে ব্যবস্থার প্রতি আস্থার অভাব এবং কার্যকর সুরক্ষা ব্যবস্থার অনুপস্থিতি। ভুক্তভোগীরা মন্তব্য করেছেন যে আইনগত প্রক্রিয়াগুলো প্রায়ই অত্যন্ত দীর্ঘসূত্রতাপূর্ণ, রাজনীতিকরণে আক্রান্ত, অথবা শেষ পর্যন্ত অকার্যকর প্রমাণিত হয়—যা তাদের আনুষ্ঠানিক প্রতিকারের পথ অনুসরণ করতে আরও নিরুৎসাহিত করে।

কিছু ভুক্তভোগী আইনগত পথে মামলা দায়ের করলে প্রতিশোধের আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তবে তারা জানান যে যদি কোনো সংস্থা তাদের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করে এবং তাদের পরিচয় ও ব্যক্তিগত তথ্য কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে রাখা হয়, তাহলে তারা দাবি উত্থাপনে আগ্রহী হতে পারেন। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের বিদ্যমান অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার মধ্যে এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ নেই।

অনেক ভুক্তভোগীর মধ্যে যে আস্থাহীনতা বিরাজ করছে, তা আরও গভীর হয়েছে ২০১৩ সালের নির্যাতন বিরোধী আইনের অধীনে দায়বদ্ধতার নজিরবিহীনতা এবং বিদ্যমান বিচারিক পথসমূহের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ প্রতিকার নিশ্চিত করতে ব্যর্থতার কারণে। একাধিক ভুক্তভোগী মন্তব্য করেছেন যে তাদের মামলা জানিয়ে তারা কোনো বাস্তব বা দৃশ্যমান সুফল পাওয়ার আশা দেখেন না।

এছাড়া, কয়েকজন ভুক্তভোগী ভয় প্রকাশ করেছেন যে তারা তথাকথিত 'গণমামলা'র অংশ হয়ে পড়তে পারেন—যা বাংলাদেশে দীর্ঘদিনের একটি নেতিবাচক চর্চা, যেখানে প্রকৃত প্রমাণ খুব কম বা না থাকলেও একটি মামলায় বহু নামযুক্ত ও নামবিহীন ব্যক্তিকে আসামি করা হয়। এই আশঙ্কার কারণে তারা আনুষ্ঠানিক আইনগত প্রক্রিয়া থেকে পুরোপুরি দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

অতএব, যদিও সাক্ষাৎকারপ্রাপ্ত ভুক্তভোগীদের একটি স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ নীতিগতভাবে ন্যায়বিচার চান, তথাপি কাঠামোগত, আর্থিক এবং ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধকতাসমূহ তাদেরকে ব্যক্তিগত আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে নিরুৎসাহিত করছে।

২০২৪ সালের ১৮ জুলাই ঢাকায় পুলিশের গুলিতে আহত এক পুরুষ ভুক্তভোগী

২০২৪ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় বিক্ষোভকারীরা ও বাংলাদেশ পুলিশ | ছবি: রায়হান আহমেদ, CC 4.0

"আমি পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলাম এবং তিন মাস হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম। এই আঘাতের কারণে আমি দীর্ঘ সময় কাজ করতে পারি না। এই সময়ে ইমু আপুর দল আমাকে একটি ছোট দোকান স্থাপন করে দিতে সহায়তা করেছে এবং সুস্থ হওয়ার সময় আমার পরিবারের আর্থিক সহায়তা করেছে।

জুলাই মাসে স্মৃতি ফাউন্ডেশন আমাকে ১,০০,০০০ টাকা (প্রায় ৮০০ মার্কিন ডলার) সহায়তা প্রদান করে; তবে আমার পায়ের চিকিৎসার ব্যয় ৩,০০,০০০ টাকারও বেশি (প্রায় ২,৪৪০ মার্কিন ডলার) হয়েছে। এর ফলে আমার মেয়ের পড়াশোনা ব্যাহত হয়েছে। ইমু আপু ও আশফিয়া আপু এক বছর ধরে আমার পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণে সহায়তা করেছেন।[1]

এখন আমার পায়ের জন্য আরও উন্নত ও অতিরিক্ত চিকিৎসার প্রয়োজন। আমার অগ্রাধিকার হলো পরিবারের জীবিকা নিশ্চিত করা এবং আমার সন্তানরা যেন তাদের শিক্ষা চালিয়ে যেতে পারে তা নিশ্চিত করা।"

1 ইমু আপু ও আশফিয়া আপু বাংলাদেশি স্থপতিদের একটি দলের সদস্য, যাদের সঙ্গে ব্লাস্ট সংযুক্ত রয়েছে। এই দলটি ভিশনারি ভয়েজ গ্রুপ নামে পরিচিত। গ্রুপটি তাদের বিভিন্ন উদ্যোগের অংশ হিসেবে তাৎক্ষণিক ভিত্তিতে বেসরকারি তহবিল সংগ্রহ করেছে এবং ভুক্তভোগীদের অভিভাবকত্বমূলক সহায়তা প্রদান করেছে—যার মধ্যে চিকিৎসা সেবায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করাও অন্তর্ভুক্ত।

ভুক্তভোগীদের প্রতিকারসংক্রান্ত অগ্রাধিকার বিষয়েও প্রশ্ন করা হয়েছিল। তাদেরকে একটি উন্মুক্ত প্রশ্ন করা হয়, যার মাধ্যমে তারা সরকারের কাছে অতিরিক্ত কোনো ব্যবস্থা বা সহায়তা চাইতে চাইলে তা উল্লেখ করার সুযোগ পান। ভুক্তভোগীদের দেওয়া উত্তরে ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ—এই তিনটি বিষয় সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার হিসেবে উঠে এসেছে (অনেকে একাধিক অগ্রাধিকার উল্লেখ করেছেন)। এই অগ্রাধিকারগুলো আন্তর্জাতিক প্রতিকারসংক্রান্ত মানদণ্ডের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে একটি সমন্বিত ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে প্রতিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে:

ভুক্তভোগীদের অতিরিক্ত অনুরোধসমূহ

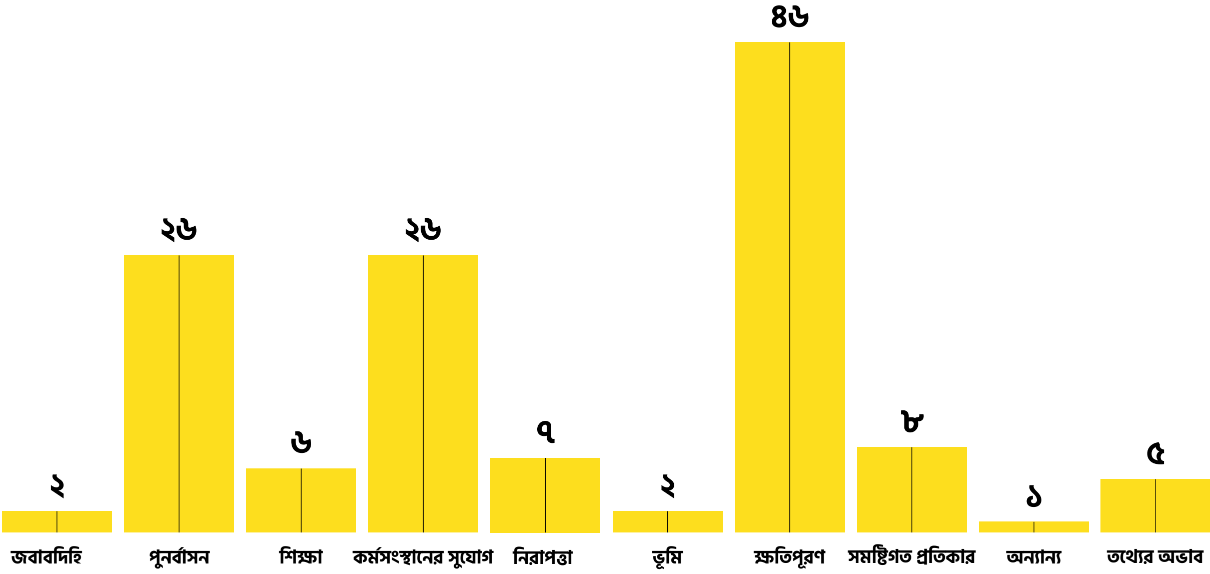

অনেক ভুক্তভোগীকে হাসপাতালগুলোতে কেবল পরীক্ষা করানো বা অন্যত্র রেফারাল পাওয়ার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। সরকার প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন করার ক্ষেত্রেও অনেকেই জটিল আমলাতান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েছেন।

ভুক্তভোগীদের সবাইকে একসূত্রে আবদ্ধ করেছে একটি বিষয়—বাংলাদেশে সংঘটিত ক্ষতির জন্য কার্যকর প্রতিকার প্রদানে রাষ্ট্রের ব্যর্থতা। সাক্ষাৎকারপ্রাপ্তদের অধিকাংশই গভীর অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন এবং জরুরি পুনর্বাসনের প্রয়োজন অনুভব করছিলেন, কারণ তাদের অনেকের আঘাত এমন ছিল যে তারা আর আগের মতো কাজে ফিরে যেতে সক্ষম হননি।

হিরনের গল্প

© Rayhan9d CC 4.0

২০২৪ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় ঢাকায় বিক্ষোভকারীরা সমবেত হয়ে জাতীয় পতাকা হাতে বাংলাদেশের সরকারি খাতের নিয়োগ ব্যবস্থায় পরিবর্তনের দাবি জানান। ছবি

সহিংসতার সময় হিরন গুরুতরভাবে আহত হন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী একটি আন্তঃধর্মীয় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ। সেই বিবাহের কারণেই তাঁদের পরিবারগুলো আগেই তাঁদের থেকে দূরত্ব তৈরি করেছিল। হিরন কাজ করার সক্ষমতা হারিয়ে ফেললে, সেই ধাক্কা সামাল দেওয়ার জন্য পাশে দাঁড়ানোর মতো কোনো বিস্তৃত পারিবারিক নেটওয়ার্ক আর অবশিষ্ট ছিল না। তাঁদের উচ্ছেদের আশঙ্কা তৎক্ষণাৎ সামনে চলে আসে।

এই ঘটনায় রাষ্ট্রীয় সহিংসতা সরাসরি সামাজিক ও ধর্মীয় প্রান্তিকতার সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

তাদের জন্য প্রতিকার অর্থ কেবল শারীরিক আঘাতের ক্ষতিপূরণ নয়। এর অর্থ হলো গৃহহীনতা প্রতিরোধ করা এবং স্বীকৃতি দেওয়া যে সামাজিক বর্জন কীভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিকে বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে এবং সহিংসতার প্রভাবকে আরও তীব্র করে।

ভুক্তভোগীদের অগ্রাধিকারসমূহ

ব্লাস্ট কর্তৃক আয়োজিত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ভুক্তভোগীরা তাদের কাছে কোন বিষয়গুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে স্পষ্ট ও দৃঢ় অবস্থান জানান—যদিও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী তারা কী ধরনের প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী হতে পারেন সে বিষয়ে তাদের বিস্তারিত জ্ঞান ছিল না।

তারা পরিবারগুলোর সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়া ঠেকাতে তাৎক্ষণিক আর্থিক সহায়তার দাবি জানান; তবে একই সঙ্গে তারা জোর দিয়ে বলেন যে এই সহায়তা যেন জীবিক পুনঃস্থাপন অন্তর্ভুক্ত করে এবং নির্ভরশীলতা সৃষ্টি না করে। প্রয়োজন হলে পুনঃপ্রশিক্ষণ এবং এমন কাঠামোবদ্ধ সহায়তা চান, যা তাদের স্বনির্ভরতা পুনরুদ্ধার করে এবং মর্যাদা বজায় রাখে।

বাংলাদেশে পরিবারের প্রধান উপার্জনকারীর সক্ষমতা (গভীরভাবে প্রোথিত লিঙ্গগত ধ্যানধারণার কারণে যা প্রায়শই পুরুষ হন) পরিবারের ভরণপোষণ নিশ্চিত করার সঙ্গে সামাজিক পরিচয় ও আত্মমর্যাদার ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সেই সক্ষমতা হারানো কেবল অর্থনৈতিক ক্ষতি নয়; এটি শারীরিক আঘাতের ওপর আরও একটি গভীর সামাজিক অপমান হিসেবে যুক্ত হয়।

ভুক্তভোগীরা মানসম্মত ও দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা পরবর্তী অনুসরণ-এর প্রয়োজনীয়তার কথাও জোর দিয়ে উল্লেখ করেছেন এবং অনেকের ক্ষেত্রেই জরুরি চিকিৎসা সেবায় প্রবেশাধিকারের তাত্ক্ষণিক প্রয়োজন রয়েছে বলে জানান। চোখের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত বহু ভুক্তভোগী দৃষ্টিশক্তি আরও খারাপ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা এবং ধারাবাহিক, মানসম্মত চিকিৎসা সেবার প্রয়োজনের কথা বলেছেন। চোখের আঘাতের ক্ষেত্রে—যা অনেক ক্ষেত্রে আংশিক বা সম্পূর্ণ অন্ধত্বের কারণ হয়েছে—বিশেষায়িত চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সেবার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি পরিণতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য এই সেবাগুলো অপরিহার্য। এ ধরনের ধারাবাহিক ও প্রয়োজনভিত্তিক সহায়তা ভুক্তভোগীদের মর্যাদা, স্বায়ত্তশাসন এবং জীবনমান রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানসিক স্বাস্থ্যের সহায়তার প্রয়োজনও বারবার উঠে এসেছে, কারণ অনেকেই উপলব্ধি করেছেন যে মানসিক আঘাত সময়ের সঙ্গে আরও গভীর হয়।

অতএব, বাংলাদেশে ভুক্তভোগীরা কেবল তাৎক্ষণিক টিকে থাকার সহায়তা নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক পুনঃএকীভূতকরণ এবং সমন্বিত চিকিৎসাগত, মানসিকসামাজিক, আইনগত ও প্রশাসনিক সেবা দাবি করছেন। ভুক্তভোগী যদি নারী হন, তবে প্রতিকার ব্যবস্থাকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যেন তিনি লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার শিকার না হন। ভুক্তভোগীরা স্পষ্ট করে বলেছেন যে প্রতিকার শুধু অর্থের বিষয় নয়; বরং মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপনের সম্ভাবনা পুনরুদ্ধার করা এবং অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের পুনরাবৃত্তি রোধ করাই এর মূল লক্ষ্য।

ভুক্তভোগীদের এসব দাবি 'রূপান্তরমূলক প্রতিকার' ধারণার প্রতিফলন, যার লক্ষ্য হলো ভুক্তভোগী ও জীবিত থাকা ব্যক্তিরা যে পরিস্থিতিতে বাস করছেন তা পরিবর্তন করা এবং লঙ্ঘনের মূল কারণ হিসেবে কাজ করা বৈষম্যমূলক কাঠামো ও সামাজিক নিয়মগুলো মোকাবিলা করা। রূপান্তরমূলক প্রতিকার কেবল লঙ্ঘনের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে, ভুক্তভোগীদের জীবনের মান উন্নয়ন এবং লঙ্ঘন সম্ভব হয়েছে—এমন পরিস্থিতি ও শর্ত দূর করতে চায়। অন্যান্য দেশে যেখানে রূপান্তরমূলক প্রতিকার বাস্তবায়িত হয়েছে, সেখানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ—যার মধ্যে নিরাপত্তা বাহিনী ও বিচার বিভাগের সদস্যরাও অন্তর্ভুক্ত—মানবাধিকার ও লিঙ্গ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, বিক্ষোভে বলপ্রয়োগ নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডসম্মত প্রোটোকল গ্রহণ, এবং প্রতিকারসংক্রান্ত সিদ্ধান্তে ভুক্তভোগীদের অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মতো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এসব ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে ভুক্তভোগীদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ, শিক্ষাবৃত্তি, উৎপাদনমুখী প্রকল্পে সহায়তা এবং কর্মসংস্থান কর্মসূচি।

রূপান্তরমূলক প্রতিকার মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর অর্থ হতে পারে—জরুরি চিকিৎসা সেবার সময়মতো সাড়া দিয়ে ভুক্তভোগীর আরও ক্ষতি প্রতিরোধ করা; প্রতিকার ব্যবস্থায় ভুক্তভোগীদের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থান স্বীকৃতি দিয়ে তাদের গৃহহীনতায় পতিত হওয়া রোধ করা; ক্ষতিপূরণকে পূর্ণাঙ্গ করা এবং কেবল অন্তর্বর্তী সহায়তায় সীমাবদ্ধ না রাখা; আহত সন্তানের জন্য সহায়তা পেতে অভিভাবকদের প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি না হতে হওয়া; এবং শোকাহত পরিবারগুলোকে বছরের পর বছর অপেক্ষা না করিয়ে স্বীকৃতি ও লঙ্ঘনের সত্য তুলে ধরা।

বাংলাদেশ সরকার ভুক্তভোগীদের জন্য প্রতিকার নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতা কতটা পালন করছে—সে বিষয়টি পরিমাপের মানদণ্ড হওয়া উচিত এখানেই।

ভুক্তভোগীদের অগ্রাধিকারসমূহ

ভুক্তভোগীদের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি, বিদ্যমান আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা বিবেচনায় নিয়ে এবং পূর্বে প্রকাশিত "বাংলাদেশে নির্যাতনের শিকারদের পুনঃপ্রতিকারের পথ অন্বেষণ" শীর্ষক ব্রিফিং পেপারে উপস্থাপিত সুপারিশসমূহের পরিপূরক হিসেবে, REDRESS ও BLAST বাংলাদেশ সরকারের প্রতি নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ পেশ করছে এবং সরকারকে আহ্বান জানাচ্ছে যেন:

- জুলাই/আগস্ট ২০২৪-এর আন্দোলনের সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত ভুক্তভোগীদের প্রয়োজন ও অগ্রাধিকারের একটি ব্যাপক ও কার্যকর মূল্যায়ন নিশ্চিত করে, যাতে পর্যাপ্ত, সহজলভ্য এবং ট্রমা সংবেদনশীল পুনঃপ্রতিকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যায়। এসব ব্যবস্থা ভুক্তভোগীদের তাৎক্ষণিক চাহিদা পূরণ করবে এবং রূপান্তরমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও পুনরাবৃত্তি নিষেধের নিশ্চয়তা অন্তর্ভুক্ত করবে। এ ধরনের পদক্ষেপে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত উভয় ধরনের পুনঃপ্রতিকার অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।

- ব্যক্তিগত পুনঃপ্রতিকারের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক সামাজিক প্রয়োজন পূরণের জন্য সহজলভ্য পুনর্বাসন সেবা, পাশাপাশি জীবিকায় সহায়তা—যেমন কর্মসংস্থান কর্মসূচি, শিক্ষা সুযোগ এবং বৃহত্তর উন্নয়নমূলক উদ্যোগ—অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

- সমষ্টিগত ও কাঠামোগত পদক্ষেপের মধ্যে থাকতে হবে জনসমক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা, মানবাধিকার মানদণ্ড ও বলপ্রয়োগ বিষয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর প্রশিক্ষণ, বিচারিক সংস্কার এবং সত্য উন্মোচনমূলক উদ্যোগ।

- পুনঃপ্রতিকার ব্যবস্থার নকশা ও বাস্তবায়নে ভুক্তভোগীদের অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে, বিশেষ করে উচ্চমাত্রার ঝুঁকিতে থাকা গোষ্ঠীসমূহ—যেমন নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের—কার্যকর অন্তর্ভুক্তি ও প্রতিনিধিত্বের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে।

- বিদ্যমান ও ভবিষ্যৎ ত্রাণ এবং পুনঃপ্রতিকার ব্যবস্থাসমূহ সম্পর্কে তথ্য প্রচার সহজতর করে, যাতে এসব তথ্য সকল জনগোষ্ঠীর জন্য সহজে প্রবেশযোগ্য, স্পষ্ট ও বোধগম্য হয়। ভুক্তভোগীরা যেন কার্যকরভাবে এসব ব্যবস্থায় প্রবেশ এবং আবেদন করতে পারেন, সে জন্য পর্যাপ্ত সহায়তা প্রদান করে।

- ভুক্তভোগীদের প্রাপ্য ক্ষতির অনুপাতে ত্রাণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদান করে, বিদ্যমান ব্যবস্থার মাধ্যমে অথবা নতুন ব্যবস্থা প্রণয়নের মাধ্যমে, এবং নিশ্চিত করে যে আঘাত ও ক্ষতির যথাযথ শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে।

কভার ছবি: Rayhan9 (CC BY 4.0)
২০২৪ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় ঢাকায় এক বিক্ষোভকারী জাতীয় পতাকা হাতে ভিড়ের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন, যখন বিক্ষোভকারীরা বাংলাদেশের সরকারি খাতের নিয়োগ ব্যবস্থায় পরিবর্তনের দাবিতে সমবেত হন।

redress.org

REDRESS
Unit G01, 65 Glasshill Street
SE1 0QR, London, UK
+44 (0)20 7793 1777
info@redress.org

REDRESS
redresstrust
Subscribe

REDRESS
Ending torture, seeking justice for survivors

blast
ব্লাস্ট